অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। মৈমনসিংহ গদ্য-গীতিকা পঁচাত্তর ।।

ময়মনসিংহের সূতিয়াখালী গ্রামের বাসিন্দা রকীব - রকীবুল হাসান। জন্ম থেকেই বেড়ে উঠেছে সে এই গ্রামে। ময়মনসিংহ শহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে সূতিয়াখালী। ওদিকে আবার এই সূতিয়াখালী থেকেই শুরু হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা। বারো শো একর জায়গা নিয়ে এই বিশাল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। রকীবের বাবা রকীবকে বলেছেন ১৯৬১ সালের আগে এর নাম ছিলো ময়মনসিংহ ভেটেনারী কলেজ। ১৯৬১-তে এর নাম হয়েছে পূর্ব-পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। রাকীব ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছে - বাবা কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইদ্দে কুনো তফাৎ আছিন? বাবা বলেছেন কলেজ ছোট আর বিশ্ববিদ্যালয় বড়। এখানে অনেক বেশী পড়তে হয়। এখান থেকে পাশ করলে ভালো ভালো চাকরী পাওয়া যায়। অফিসার হওয়া যায়।

রাকীবের স্বপ্ন বড় অফিসার হবে একদিন। সেদিন ওদের বেড়ার ঘরটা যেটা দিয়ে পানি পড়ে সেটা ঠিক করবে। ওদের স্কুলটাতেও পানি পড়ে যদিও ওটা টিনের ঘর তবুও বড় অফিসার হয়ে স্কুলটাও ঠিক করে দেবে। ওর ধারণা বড় অফিসার হলে অনেক অনেক টাকা হয়। রকীবের বড় একটা গুণ ও সব কিছু জানতে চায়, বুঝুক আর না বুঝুক। তবে ওর বাবা তবিবুল হাসান রকীবের কথায় কখনো বিরক্ত হন না। একদিন রকীব জিজ্ঞেস করলো - বাবা কনছেন দেহি পূর্ব-পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মইদ্দে তফাৎ আছে কুনো? বাবা তাকে বলেছেন কেমন করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হলো, কেমন করে মুক্তিযুদ্ধ হলো, কেমন করে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে অবশেষে একাত্তরের ৭ই মার্চে ঢাকার রেসকোর্সে স্বাধীনতার ডাক দিলেন - এ সবই বললেন। তবিবুল হাসান বঙ্গবন্ধুর আজীবন ভক্ত তাই তাঁর কথা বলতেই তিনি খুব আবেগপ্রবন হয়ে পড়েন। রকীব সুধায় - আপনে হ্যারে দ্যাখছুইন? তবিবুল বলেন তিনি দেখেননি তবে বঙ্গবন্ধুর মুখ তাঁর মুখস্থ। কাগজ পেন্সিল নিয়ে কেউ বসিয়ে দিলে মনে হয় হুবহু তাঁকে এঁকে দিতে পারবেন এমনই অভিব্যক্তি।

বাবার কাছে শুনতে শুনতে রকীবও যেন বঙ্গবন্ধুর ভক্ত হয়ে গেল - কিছু বুঝুক আর না বুঝুক। এরই মধ্যে একদিন স্কুল ছুটির পর বাবা বাবা বলে চিৎকার করতে করতে রকীব বাড়ীতে ছুটছে। দারুণ খুশী আর উত্তেজনা তার। বাড়ীতে ঢুকেই জানলো বাবা তখনো কাজ থেকে ফেরেনি। কয়েকবার জিজ্ঞেস করার পরও মাকে বলবে না তার খুশী আনন্দ উত্তেজনার কথা। তার ছোটাছুটি দেখে কে। একবার ঘরে একবার বাইরে বাবার পথ পানে চেয়ে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আঁধার হয়ে গেছে পাশে ব্রহ্মপুত্রে তখন জোয়ারের শব্দ। সেই জোয়ারের ঢেউ যেন রকীবের বুকে - ছলাৎ ছলাৎ ছলাৎ বাবা আইউন যে জলদি আইউন যে। অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে এবার ভেতরে গেল। পড়াতেও আজ মন নেই। হারিকেনটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওই হারিকেনের চিমনিটা যেন বঙ্গবন্ধুর মুখ। এরই মাঝে একসময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। রকীব ছুটে গিয়ে দরজা খুলে চিৎকার - বাবা বাবা হুনছইন - আপনার বঙ্গবন্ধু আইতাছে। হাঁছা হাঁছাই। বিশ্বাস করুইন যে। আমগো ব্যবাকটিরে যাইবার কইছে। আমরা যাইবাম। বুজলাম কিন্তুক কুনানে আইতাছে? ওই ইনবারসিটিতে আইতাছে আমরা যাইবাম। আপনি যাইতাইন না? যাইবাম যাইবাম। বাপে পুতে এক লগে দেখবাম। ব্যাডা একখান।

১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ বঙ্গবন্ধু আসবেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে। চারিদিকে সাজ সাজ রব। ক্যাম্পাসের আশপাশের সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যেতে বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য। রকীব তার বন্ধুবান্ধবসহ গেছে। রাস্তার দু'পাশে সারি করে ওদের দাঁড় করানো হয়েছে। সকাল থেকেই ওরা দাঁড়িয়ে আছে হেলিকপ্টারটা কখন নামবে। পুলিশরা বার বার করে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে কেউ যেন হেলিকপ্টারের দিকে দৌড় না দেয়। ইনভার্সিটির ভিতরে রকীব বহুবার এসেছে কিন্তু আজকের মত এতো সুন্দর আর কখনো লাগেনি। রকীব ভাবছে - ইস দৌড়ে গিয়ে যদি বঙ্গবন্ধুকে একবার জড়িয়ে ধরতে পারতো?

আইতাছে আইতাছে হেই যে উড়াল দিয়া আইতাছে। হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে পোলাপানগুলোর চিৎকার। রেললাইনের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রানওয়েটার উপর হেলিকপ্টারটা নামলো। সেখান থেকে বাংলাদেশের পতাকা লাগানো লম্বা একটা গাড়ীতে করে বঙ্গবন্ধুকে পাঁচতলার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখান থেকে তিনি হেঁটে পাঁচতলার করিডোর দিয়ে সোজা সমাবর্তন মন্ডপের মঞ্চে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। এবার আর রকীবদের ঠেকিয়ে রাখা গেল না। সকল বেষ্টনী ভেদ করে ওরা তাদের পরিকল্পনা মাফিক সমাবর্তন মন্ডপের চারিদিকে করিডোরের ছাদের উপর উঠে বসে থাকলো। নিরাপত্তার কারণে শুধু শিশু কিশোর ছাড়া আর কাওকে ছাদের উপর উঠতে দেয়া হয়নি।

নানান আনুষ্ঠানিকতা সেরে বঙ্গবন্ধু এবার বক্তৃতা দিতে উঠলেন। শুরুতেই করিডোরের ছাদের উপর বসে থাকা

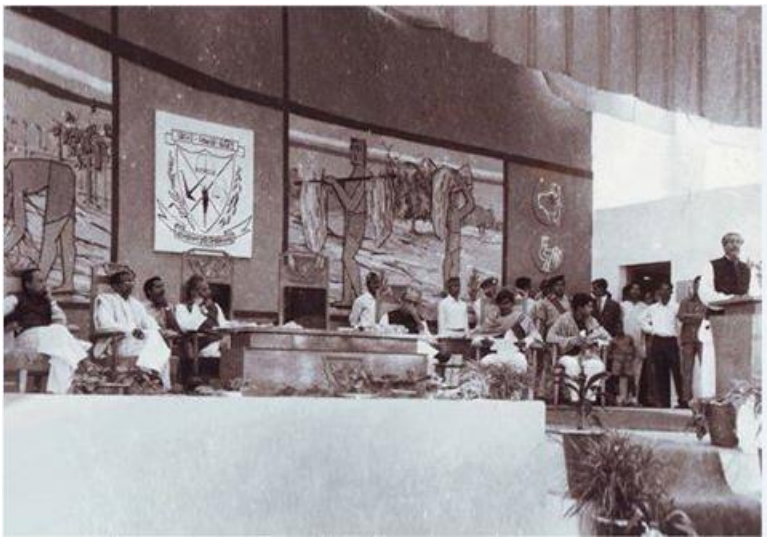

পোলাপানগুলোকে উদ্দেশ্য করে বললেন - এ্যাই পোলাপান তোরা থামবি? খালি কিচির মিচির কিচির মিচির । আমি যেইখানেই যাই এই গুলান আমার পিছে পিছে আছে। তিনি আবার বললেন তোরা থামবি? পোলাপানগুলো হাসে আর বলে "না"। থামবি? না। বেশ তোরা না থামলে আমি আর কোন কথা বলবো না। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত সব চুপ হয়ে গেলো। রকীব খেয়াল রাখছে কখন তিনি বক্তৃতা শেষ করে আবার করিডোরে ফিরে আসেন। মঞ্চের সব কাজ শেষে যখন বঙ্গবন্ধু মঞ্চ থেকে নেমে করিডোর দিয়ে হাঁটছেন রকীব ভীড়ের মধ্যে চিৎকার করছে - বঙ্গবন্ধু দাদু বঙ্গবন্ধু দাদু হুনছইন। খারুইনযে একটা কথা বলবাম খারুইন খারুইনযে। নিরাপত্তা কর্মীরা রকীবকে ধাওয়া দেয় কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কানে ততক্ষণে রকীবের আকূতি পোঁছে গেছে। থমকে দাঁড়ালেন, বললেন - ছেলেটিকে নিয়ে আসো আমার কাছে দেখি কী বলে?

রকীব বঙ্গবন্ধুর সামনে এসে বললো - দাদু হুনইন যে, আমাগো ঘর দিয়া যে ম্যাঘের পানি পড়ে হেইডা ঠিক করণ লাগতো না তয় স্কুলের ঘরে যে ম্যাঘের পানি পড়ে হেইডা ঠিক করণের কথা কইনযে। হ্যারা আপনের কথা হুনবো বুঝছইন? বঙ্গবন্ধু হতচকিত হয়ে পড়লেন। এ কী করে সম্ভব? এ যে হুবহু তাঁর ছেলেবেলার কাহিনী। ১৯৩৮ সালে পূর্ব-বাংলার মূখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং বাণিজ্য ও পল্লী-উন্নয়ন মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ শহরে এসে মিশন স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তরুণ মুজিব তখন তাঁর বন্ধুদের নিয়ে স্কুলে মন্ত্রীদ্বয়কে সংবর্ধনা জানাবার কাজে অংশ নেন এবং কোন এক সুযোগে সাহস করে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীদ্বয়ের কাছে স্কুলের হোস্টেলের ভাঙা ছাদ মেরামতের দাবি জানান। মন্ত্রীদ্বয় তরুণ মুজিবের এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হন এবং স্কুল হোস্টেলের ছাদ মেরামতের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করে দেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে বঙ্গবন্ধু রকীবকে জিজ্ঞেস করলেন -

- তোর কী নাম?
- রকীব - রকীবুল হাসান
- বাবার নাম?
- তবিবুল হাসান।
- স্কুলের নাম
- হুইত্যাখালি (সূতিয়াখালি) হাই স্কুল
- ঠিক আছে স্কুলে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যাবে শীগগীরি।
- কোন ক্লাসে পড়িস্।
- ক্লাস নাইনে।
- গুড এসএসসি পাশ কইরা ঢাকায় আইসা আমার সাথে দেখা করবি। তোকে ভাল কলেজে ভর্ত্তি কইরা দিমু। ভাল ফল করবি। অনেক বড় হবি।
- দাদু আমি অফিসার হমু। আমগো বাড়ীটা ...
- বেশ ঢাকায় লেখাপড়া কইরা তুই অনেক বড় অফিসার হবি।

বঙ্গবন্ধু রকীবের মধ্যে ভবিষ্যতের শেখ মুজিবকে দেখতে পাচ্ছেন যেন।

রকীবের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো। বঙ্গবন্ধুর পাঁ ছুঁয়ে সালাম করে চলে গেলো। রাতে রকীবের কিছুতেই আর ঘুম আসে না। ওর চোখর সামনে তখন ঢাকা, বড় অফিসার, বাড়ী মেরামত এ সবই ঘুরপাক খায়। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখছে ওর দাদু ওকে ডাকছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

সময় গড়িয়ে যায়। রকীব এসএসসি পাশ করেছে প্রথম বিভাগে। এখন মাথায় তার একই চিন্তা ঢাকায় যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু দাদুর সাথে দেখা করতে হবে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব। গেলে ওকে তিনি চিনতে পারবেন তো? এতো দিনের কথা তাঁর মনে থাকবে কী? তবে একদিন রকীব বাবার কাছে শুনেছে বঙ্গবন্ধুর নাকি প্রখর স্মৃতি শক্তি। মানুষের নাম ঠিকানা তিনি কোনদিনও ভোলেন না। অতএব রকীবকেও তিনি নিশ্চয়ই মনে রাখবেন।

এরই মধ্যে রকীবের গ্রামের মেধাবী ছাত্র তৌহিদ যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হঠাৎ করে বাড়ীতে এলেন। এটা ১৯৭৫-এর আগষ্টের শুরুর ঘটনা। তৌহিদ গ্রামে এলে রকীব নিয়মিত তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখে। তাঁর কাছে স্বপ্নের কথা বলে। বঙ্গবন্ধু দাদুকে নিয়ে আলোচনা করে। তো সেবার তৌহিদ বললো ১৫ আগষ্ট তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে। সেখানে বঙ্গবন্ধু আসবেন। রকীবের চোখের সামনে ভেসে উঠলো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের কথা। ভাবছে এখানে যখন পেরেছে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও তার দাদুকে ধরতে পারবে। বলতে পারবে দেহুইন যে আইস্সা পড়ছি। ফার্স্ট ডিভিশন পাইছি। এলা ভর্ত্তি কইরা দেইনযে।

তৌহিদকে ধরে বসলো তার সাথে সে ঢাকায় যাবে। তৌহিদ অনেক বোঝালো এখানে যেটা ঘটেছে সেটা ঢাকাতে ঘটা সম্ভব নয়। এখানে না হয় স্কুলের ছেলেমেয়েদের আসতে দিয়েছে ওখানে তো তা হবে না। রকীব কিছুতেই কিছু শোনে না। ওর ধারণা ও যদি চিক্কর পাইড়া একবার দাদু ডাকতে পারে বঙ্গবন্ধু থেমে যাবেন। যাহোক রকীবকে অবশেষে ঢাকায় নিয়ে যেতে বাধ্য হলো তৌহিদ। কিন্তু তার ভয় যদি সিকিউরিটির লোকজন জিজ্ঞেস করে এ ছেলে এখানে কী উদ্দেশ্যে তাহলে তো বিপদ হয়ে যাবে। রকীবকে বললো ঘর থেকে বেরুনো মানা। কেবল ১৫ই আগষ্টের দিন বেরুবে। তৌহিদ চেষ্টা করবে কোন ভাবে কোন কিছু করা যায় কী না। যদিও সম্ভাবনা ক্ষীণ তবুও রকীবকে হতাশ করতে চাইছে না।

১৫ই আগষ্ট ভোরে হঠাৎ চারিদিকে গোলাগুলির শব্দ। তৌহিদ ধড়ফড় করে উঠে বসে। বুঝতে পারে না কিসের শব্দ। ভাবছে সমাবর্তন উৎসব তাই বাজি ফোটানো হচ্ছে। না - ক্রমশঃ সে শব্দ ভারী হচ্ছে। মনে হচ্ছে তা যেন

ওদের ক্যাম্পাসের মধ্যেই। ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে। এক সময়ে রকীবও ঘুম থেকে উঠে পড়ে। গোলাগুলির শব্দে ভড়কে গিয়ে তৌহিদকে জড়িয়ে ধরে। তৌহিদ কী করবে বুঝতে পারছে না। বাইরে বেরুতে সাহস পাচ্ছেনা। হঠাৎ চোখে পড়লো ট্রানজিসটারটা। ভাবলো ওটা একটু চালিয়ে দেখা যাক কোন খবর পাওয়া যায় কী না। ওটা খুলতেই শোনা গেলো - "আমি মেজর ডালিম বলছি, অদ্য সকাল হতে খন্দকার মোশতাক আহম্মদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে। শেখ মুজিব ও তার দুর্নীতিবাজ সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে। এখন থেকে সামরিক আইন জারি করা হলো । আপনারা সবাই আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। আপনারা নিশ্চিত থাকুন কোন অসুবিধা হইবে না। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।" এর পরক্ষণে শোনা গেল - 'বাংলাদেশ বেতার, একটি বিশেষ ঘোষণা - খন্দকার মুশতাক আহম্মদের নেতৃত্বে আজ ভোরে সামরিক বাহিনী দেশের সর্বময় ক্ষমতা দখল করেছেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। খন্দকার মুশতাক দেশের নতুন প্রেসিডেন্ট ... ...।

না আমি মানতাম না মানতাম না - চিৎকার করে ওঠে রকীব। তৌহিদ বলে চুপ চুপ। তবু সে থামে না। এক সময়ে তৌহিদ ওর মুখ চেপে ধরে। রকীব এক ঝটকায় তৌহিদের বাহু থেকে নিজেকে মুক্ত করে চিৎকার করতে করতে ঘরের দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে যায়। আমার দাদুরে ক্যাডা মারছে আমি হেরে আঙ্গাইয়া হালবাম। দাদু আপনি মরতুইন না দাদু আপনি মরতুইন না খারুইনযে আমি আইতাছি। সব মিছা কথা। আপনেরে মারবো কেডা? ... । পিছে পিছে ছুটছে তৌহিদ। চিৎকার করে রকীবকে ডাকছে। রকীবকে থামনো যাচ্ছে না। এক সময় ক্লান্ত তৌহিদ থেমে গেল। চারিদিকে তখন সেনাদল। কারফিউ ঘোষনা করছে। সবাইকে হলের ভিতরে থাকবার নির্দেশ দিচ্ছে। সব কিছু থেমে গেল। কেবল রকীবই থামতে পারে নি। ছুটছে তো ছুটছেই। কবে কোথায় কখন কিভাবে রকীব থেমেছিলো তা আর কেউ বলতে পারেনি। কোনদিন কেউ জানতে পারেনি। রকীবের সাথে ওর দাদুর কোথাও কোনভাবে আর দেখা হয়েছিলো কিনা তাও কেউ কোনদিন বলতে পারেনি।